দ্বিতীয় অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য "

প্রাক্-রবীন্দ্র-গল্পধারায় তেমন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। **"বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলা ছোটগল্প জীবনের বিচিত্র রস প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য প্রচুর। লেখকেরা এই শিল্পরূপটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা করছিলেন। জীবনের বহু সমস্যা, সমাজের নানা সমস্যা তখন ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পানপাত্রে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল।"**[১] বনফুল বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। তিনি বিষয়-বৈচিত্র্য পিয়াসী শিল্পী। তাঁর গল্পের সংখ্যা প্রায় ছ'শ। সর্বসাকুল্যে ৫৮৬ টি গল্পের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৭৮টি বনফুলের সম্পূর্ণ রচনাবলীতে পাওয়া যায়; বাকী ৮টি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত হয়ে থেকে গেছে। তবে **'বাণীশিল্প'** থেকে বনফুলের পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায় দু'খণ্ডে **'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'** প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রথম খণ্ডে ২৬৭টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৩টি গল্প রয়েছে। অর্থাৎ দু'খণ্ডে ৫৬০টি গল্প মুদ্রিত। তা সে যতগুলি গল্প পাওয়া গেছে তাদের বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি আলাদা। বনফুলের ছোটগল্পে কোন একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। এই বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতারই বিচিত্র প্রকাশ। অভিজ্ঞতাবাদ (empericism) -এর সত্যের ভিত্তিতেই তিনি তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ের বিচিত্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যতটুকু জেনেছেন, যেভাবে জেনেছে, সেভাবেই সেই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন গল্পে নিজস্ব জীবনদর্শন অনুযায়ী। তাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র দিন দিন যত বিস্তৃত, প্রসারিত হয়েছে, জীবনের যত বিচিত্র ঢেউ এসে লেগেছে তাঁর মনের কিনারায় জীবন সত্যও তত নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর গল্পে। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প বিচিত্রস্বাদী হয়েছে। তাই 'ফুল, পশু-পাখি, জনমানুষ থেকে শুরু করে 'আগাছা' পর্যন্ত তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। ড. সুকুমার সেন গল্প শতকের ভূমিকায় লিখেছেন (২২.৭, '৬৬)— **"বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ভালোগল্প লিখেছেন ও লেখেন এমন সাহিত্যিকের খুব অভাব নেই। বলা যায় তাঁদের অনেকেরই গল্পে নিজস্বতা আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ছোটগল্পে সুস্বাদের ও সুবাসের বৈচিত্র্য কম। তাঁদের কেউ কেউ জলের মতো ঘুরে ঘুরে অথবা দক্ষিণা হাওয়ার মতো ফিরে ফিরে চমৎকারভাবে একই কথা কন। সেই এককথার একতারা - দোতারাতেই তাদের বিশেষ মহিমা। বনফুলের একতারা, দোতারা বাজেনি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ।....**

বনফুলের গল্পে কারিগরের দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু - বিচিত্র বহু বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্প গড়া নয়। এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর। বনফুলের গল্পে যে সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়তো তাদের কেউই কখনো দেখা দেয় নি, অথচ মনে হয় তারা যে

অপরিচিতি নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব। বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে— ফোটোগ্রাফ ওঠেনি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাবকুমারের গল্পের এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাতবাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে বনফুলের গল্পে খুশি - অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।"[২] ড. সেনের এই বিদগ্ধ মত যথার্থ।

বনফুল জীবন সমুদ্রের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে চয়ন করেছেন তাঁর বিচিত্রস্বাদী গল্পের বিষয়। সে কারণে গল্পগুলি পড়তে আমাদের কখনো একঘেয়েমি আসে না। ড. সুকুমার সেন সাহিত্যিকদের দু -দলে ভাগ করেছেন—এক. গুটি পোকার দল, দুই. বাবুই পাখির দল। দু জাতেরই এই দুরকম প্রাণীই বাসা তৈরী করে, তবে বাসার ধরন প্রকৃতি ও নির্মাণে দু - দলের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। গুটি পোকা জাতের সাহিত্যিকেরা একই কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন। তাঁদের গানের যন্ত্র একতারা। তা সে একই সুরের না হোক একই তানের। কিন্তু বাবুই জাতীয় সাহিত্যিকেরা কখনো এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকেন না; নিত্য নতুনতার দিকে তাঁর অন্বেষা, অভিসার। তাই বাবুই জাতের সাহিত্যিকেরা আমাদের কখনো কখনো এক উদার উন্মুক্ত আকাশের নানা রঙের রামধনুর সৌন্দর্য্যে মোহিত করেন। **"গুটি পোকা সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক।... তাঁর চোখ ছিল সজাগ - বাইরের দিকে, অতন্দ্রিতভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়। ...**

বলাইবাবু কাহিনী লিখেছেন। দেখেশুনে ভেবে-চিন্তে যথাসাধ্য নতুনতর করে। তিনি পঠিক মোহন সিরিজ পাকাবার জন্যে ঢেরি ঘোরান নি। তাই বনফুলের রচনায় যে বিচিত্রতার সম্ভার পাই তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় পাইনা।"[৩]

বনফুল ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে এবং বাল্য কৈশোর-যৌবন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার, মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার, তার উত্তাপ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষাগ্রহণ ও পেশার সূত্রে। শুধু পেশা কেন, তাঁর অন্তরের একটি অদম্য কৌতূহল মানুষের জীবন অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত ছিল। ফলে ৮০ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর বিচিত্র শ্রেণীর বিভিন্ন গোত্রের মানুষ, মানুষের স্বভাব চরিত্র কোন না কোনভাবে জান্তে অজান্তে তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের রূপচিত্রণে তাই তাঁর গল্পও বিষয়-বৈচিত্র্যে মনোহারী হয়েছে। বনফুল **"দেখেছেন অজস্র চরিত্র, উপলব্ধি করেছেন অজস্র চরিত্র, বলেছেনও অজস্র চরিত্রের কথা এবং কল্পনাও করেছেন অজস্র চরিত্র। এই অজস্র চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও মনের ইতিহাস বলে গিয়েছেন তিনি।"**[৪] স্বাভাবিকভাবেই তাতে মানব জীবনের ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কথা, মানব চরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতির কথা ,

অদৃষ্টের কাছে মানব জীবনের অসহায়তার কথা, ভণ্ডামি, দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের কথা, আদিম জৈব প্রবৃত্তির কাছে মানবজীবনের অসহায়তা ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। বৈচিত্র্যের অভিলাষী বনফুল সচেতনভাবেই এই বিষয়-বৈচিত্র্য চর্চা করতেন। শুধু বিষয়-বস্তুতে কেন, আঙ্গিক-প্রকরণে, রচনা পরিকল্পনায়ও সচেতন প্রয়াস করেছেন। বনফুল নিজেই বলেছেন— **"আমি আমার খেয়াল-খুশি-মত যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছি। আমি চেষ্টা করিতাম, যাহাতে আমার দুইটি বই যেন এক স্বাদের না হয়।"**[৫] বস্তুতঃপক্ষে দুটি বই কেন, বনফুলের দুটি গল্প একরকম নয়। তাঁর এই বিশেষত্বকে বন্ধু পরিমল গোস্বামী বলেছেন **'একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য'**। বনফুলের এই চরিত্রগত বিশিষ্টতা তাঁর গল্পেও প্রতিফলিত। কেননা, সাহিত্য স্রষ্টা-নিরপেক্ষ নয়।

আগেই বলেছি, বনফুলের এই বিষয়-বৈচিত্র্যের পেছনে যে প্রভাবটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল, তা হল তাঁর প্রতিদিনের দেখা অজস্র মানুষের চরিত্র, জীবন। বনফুলের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বিহারে। এবিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন **"আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বিহারে।"**[৬] বনফুলের জন্ম গঙ্গা ও কোশী নদের সঙ্গমস্থল মরিহারী গ্রামে। সেই গ্রাম্য ও অরণ্য পরিবেশেই বনফুলের জীবন-চেতনার উন্মেষ। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বনফুলের কাছে ছিল চিররহস্যাবৃত ও চিরআকাঙ্ক্ষিত। গ্রামের পথে-ঘাটে, বনে-বাদারে ঘুরে বেড়াতেন তিনি তাদের বাড়ির মুসলমান চাকর চামরুর স্ত্রীর সঙ্গে। জঙ্গলে ঘুরতে ভালবাসতেন বলে তাঁর ডাকনাম 'জংলী বাবু' রাখা হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ছাড়াও বনফুলের উপর তাঁর নিজস্ব পরিবারের উদার অন্তরঙ্গ আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছিল। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই গ্রামের এক বিখ্যাত ডাক্তার ও জনপ্রিয় মানুষ। মাতা মৃণালিনী দেবী রক্ষণশীল প্রকৃতির হলেও যথেষ্ট প্রগতিবাদী মহিলা ছিলেন। পিতা সত্যচরণ ছিলেন উদার মতাবলম্বী, সর্বসংস্কারমুক্ত, আশ্রিত বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী পরার্থপর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সনাতন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য হয়েও তাই সত্যচরণ রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। স্বভাবতই তাঁর গৃহ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের অবারিত দ্বার ছিল। তাঁর নিজস্ব আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও পরিচারকগণ, পরিচিত-অপরিচিত নানা ব্যক্তি, মজুর, রাঁধুনি, প্ল্যাটফর্মের যাত্রী— এক কথায় সকল শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল সত্যচরণের বাড়ি। এছাড়া তাঁদের চাষের কিছু জমি-জমাও ছিল। তার জন্য দশ-বারো জন কৃষক-মজুরও থাকতেন বাড়িতে, তাছাড়া নানা রকম গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ, অনেক পাখি, দু'টি বড় জাতের পাহাড়ী ঘোড়া ছিল, আর সেগুলি দেখা-শোনা ছিল করার জন্য ছিল আরো কিছু পরিচারক ও একজন সহিস। বর্ণহিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু এমনকি মুসলমানও সত্যচরণের বাড়িতে প্রতিপালিত হতেন। পরিবারের লোকজন ছাড়াও অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতিনিয়ত আনাগোনা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। কারণ, সত্যচরণের বাড়ি ছিল রেল ষ্টেশনের পাশেই। পিতার চরিত্রের এই উদার আন্তরিক

আতিথেয়তা সম্পর্কে বনফুল লিখেছেন— "আমাদের বাড়ি তখন অনেক লোকের আশ্রয়স্থল। বাবার অনেক রোগীদের আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন। অনেক চাকুরী প্রার্থী আসিয়া জুটিতেন। বাবাদের একটা থিয়েটার পার্টী ছিল। সে পার্টীর অনেক লোকের আস্তানা ছিল আমাদের বাড়িতে। তাছাড়া আমাদের বাড়ীর কাছে রেলওয়ে ষ্টেশন থাকাতে অনেক লোক আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবেলা খাইয়া তাহার পর ট্রেন ধরিতেন। ও অঞ্চলের জমিদারদের আমলা গোমস্তারা প্রায়ই মোকদ্দমা উপলক্ষে কাটিহার কিংবা পূর্ণিয়া যাইতেন। বাবা সকলেরই ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অসংকোচে আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন এক-আধবেলা। গঙ্গার ঘাটও ছিল আমাদের বাড়ীর নিকটে। সুতরাং গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে বেশ জনসমাগম হইত। ও অঞ্চলে কোনও হোটেল ছিল না, ডাকবাংলো তখনও হয় নাই, সুতরাং অনেক গভর্নমেন্ট অফিসাররা আসিয়াও আমাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। শিকার করিবার জন্য অনেক পক্ষীলোলুপ শিকারীও মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন আমাদের বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ দশ - বারোজন বাহিরের লোক আহারাদি করিতেন তখন।"[৭] — এই বিশাল পারিবারিক পরিধির মধ্যে বনফুল বড় হয়েছিলেন। পিতার এই উদার, মহৎ চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বালক বনফুলের চরিত্রের ভিত তৈরী হয়েছিল— গড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে পিতার সাহিত্যানুরাগী মন, যা বনফুলকে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকা যেমন 'বসুমতি', 'বান্ধব', 'সুপ্রভাত', 'প্রবাসী', 'হিতবাদী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'বঙ্গবাণী' তাঁদের বাড়িতে রীতিমত আসতো। এছাড়া মাতা মৃণালিনীর নির্লোভ, নিঃস্বার্থপরতা, ধার্মিক, তেজস্বিনী মূর্তির অসাধারণ ধৈর্য্য ও নৈপুণ্য বনফুলকে প্রভাবিত করেছিল। এইভাবে পিতার উদারতাপূর্ণ মানসিকতা এবং মাতার শাণিত উজ্জ্বলতা, বলতে পারি বিপরীতমুখী দুই জীবনাদর্শের মধ্যে বনফুলের চরিত্র তৈরী হতে থাকে। তাছাড়া কঠোর রক্ষণশীল কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর জীবনভূমি তৈরীতে প্রভাব ফেলেছিল। এভাবে শৈশব-কৈশোর থেকে উন্মুখ যৌবনাবধি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অস্থির পরিস্থিতির স্খলিত জীবনযাত্রার সমন্বয় অন্বেষণ করতে করতে বনফুলের এক নতুন জীবন দৃষ্টি তৈরী হতে থাকে নিজস্ব জীবন ভাবনার মধ্য দিয়ে, যা তাঁর পরবর্তী সৃজনকর্মে লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ণিয়া জেলার মাইনর শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বনফুল সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেই বছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, বনফুল তখন ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। বনফুলের মনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কারণ, বালক বনফুলের চেতনায় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা তখনও ধরা দেয়নি। তবু এই সাহেবগঞ্জের বনফুলের সাহিত্য-জীবনের সূচনা ও প্রেরণাস্থল হিসেবে কম ভূমিকা ছিল না। তাঁর নিজের কথায়— "সাহেবগঞ্জে আমার কৈশোর জীবন কাটিয়াছে। বলিতে গেলে আমার জীবনের প্রস্তুতিপর্ব — এই সাহেবগঞ্জ।.

. . . বহুকাল পূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সাহেবগঞ্জকে এখনও ভুলি নাই। . . . . সাহেবগঞ্জের পাহাড়তলী, পাহাড়ের ঝর্ণা, সাহেবগঞ্জের ধারে নীলকুঠি, সেখানে বটুদার নাইট স্কুল — এসব ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"[৮] ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাটিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বনফুল হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে I.S.C. পড়ার জন্য ভর্তি হন। হাজারীবাগের পাদরিদের কলেজে পড়ে তাঁর মনের পরিধি অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে। বলে রাখা প্রয়োজন, হাজারীবাগেই থাকাকালীন বনফুল মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ভাষার ডিকেন্স, থ্যাকারে, স্কট, লরেন্স, মিল্টন, শেক্সপীয়ার, টলস্টয়, হুগো প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করেন এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়েও পড়াশোনা করেন।

এর পর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে হাজারীবাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে বনফুল কলকাতায় আসেন। মফঃস্বলের ছেলের এই প্রথম নগর দর্শন হল। এতে শুধু দেখা নয়, বাংলা দেশের বৃহৎ নাগরিক জীবনযাত্রা ও তার চরিত্র সম্পর্কে প্রথম পরিচয়। প্রথমে বনফুল বাবার মামার বাড়ী শেওড়াফুলী থেকে কলেজে ডেলী প্যসেঞ্জারী করতেন। তারপর তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ও পরে মেডিক্যাল কলেজের পাশে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিংয়ে এবং তারও পরে বৌবাজারের ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়াশোনা করেছেন। বনফুল কলকাতার সঙ্গে পরিচয়ের কথা প্রসঙ্গে স্মৃতি কথায় চলেছেন— **"আমার বিহারে জন্ম। বাংলাদেশের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। শেওড়াফুলী হইতে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিতে করিতে আমার সে পরিচয় হইয়া গেল।"**[৯] এই অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বনফুলের অভিজ্ঞতার পরিধি আরো বিস্তৃত হতে থাকে। বনফুলের বয়স তখন ২১ বছর। উন্মুখ যৌবনের অদম্য আগ্রহ ও কৌতূহল বশে বনফুল তীব্র পারিপার্শ্বিক সচেতন হয়ে যে জীবনের রূপ দেখলেন, তা তাঁর মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করেছিল। তিনি স্মৃতি কথায় লিখেছেন— **"সমস্ত মিলাইয়া মনে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। স্বার্থপরতার রং, নীচুতার রং, কলহ - প্রবণতার রং, রসিকতার রং, ভাব প্রবণতার রং, ছ্যাবলামির রং, অসভ্যতার রং, ভদ্রতার রং — অনেক রঙের বিচিত্র ছবি সেটি।"**[১০] বস্তুতঃপক্ষে এই বিচিত্র বর্ণের মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য অনিবার্যভাবে আপনা আপনি রূপগ্রহণ করেছে। তবে তাতে বনফুলের সচেতন প্রয়াসও ছিল। এছাড়া বাবার মামার বাড়ি শেওড়াফুলী থেকে কোলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার জন্য ট্রেনের নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্রও তিনি দেখেছেন, যা তাঁর ছোটগল্পে একটি বড় পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

বনফুল কোলকাতায় ছিলেন তিন-চার বছর। কিন্তু এই তিন চার বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিল্পীর ভিত্তিভূমি তৈরীতে সহায়তা করেছিল। মানব জীবনের বাস্তব জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষচিত্র তাঁর হৃদয়ে দাগ কাটতে থাকল। তখন সময়টা ছিল ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের হতাশা, নৈরাশ্য, সংশয়াহত ভঙ্গুর জীবন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকার সমস্যা,

আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত মানব জীবন প্রভৃতিতে তখন মহানাগরিক জীবন ভরপুর। মহানগরের এই বিচিত্র জীবনের স্রোত চির-কৌতূহলী বনফুলের মনে জীবনকে আরো গভীর ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জানার আগ্রহ বাড়িয়েদিল। সে সময় অবসর পেলেই বনফুল মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন মানব জীবনের সরাসরি উত্তাপ নেওয়ার জন্য—**"আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম।. . . . কলিকাতার রাস্তায় ফুটপাথে তখন হাঁটা অসম্ভব ছিল না। কলিকাতা শহরকে এবং সদাচঞ্চল জীবনধারাকে আমি যেন মনে মনে গ্রাস করিতাম।"**[১১]

কোলকাতায় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় পরিমল গোস্বামী, শিবদাস বসুমল্লিক, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে। কোলকাতায় তিন-চার বছর পড়ার পর বনফুলকে চলে যেতে হয় পাটনায়। কারণ ১৯২৬ সাল নাগাদ পাটনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী বনফুলকে কে কোলকাতা ছেড়ে পাটনা মেডিকেল কলেজে পাঠ নিতে হয়। পাটনা মেডিকেল কলেজে প্রসূতি বিভাগ বা মেটারনিটি ওয়ার্ড না থাকায় বিহার সরকার ব্যাঙ্গালোরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই সূত্রে এক মাসের জন্য দক্ষিণ ভারতের হাসপাতালের ও জনজীবনের অভিজ্ঞতাও হয় বনফুলের।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বনফুল ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেন। ডাক্তারী পাশ করার কিছুদিন পরেই পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার -হাউস -সার্জেন রূপে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার আত্মসম্মান হানিকর প্রথার জন্য সে চাকুরী গ্রহণ করেন নি। পরে কোলকাতায় ফিরে মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজির ডেমস্ট্রেটর ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছে একবছর ক্লিনিক্যাল প্যাথলজির ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং সমাপ্ত করে বনফুল আনুমানিক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের মিউনিসিপালিটির হাসপাতালে মেডিকেল অফিসারের চাকরি গ্রহণ করেন। ল্যাবরেটরীর চাকরি গ্রহণ করার কারণ হল— সাহিত্য রচনা করার প্রবল আগ্রহ। এতে ডাক্তারীও করা চলল, সাহিত্য রচনারও সময় পাওয়া গেল। এবিষয়ে ড. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন— **"আমি সাহিত্য চর্চা করিতে চাই। ল্যাবরেটারি প্র্যাকটিশ করলে তার জন্য সময় পাবো। চাকরী করলে তা পাবো না। জেনারেল প্র্যাকটিশ করলেও তা সম্ভব নয়।"**[১২] তাই বনবিহারীর সহায়তায় চারুব্রতের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান বনফুল। আজিমগঞ্জে বছর খানেক ছিলেন বনফুল। এ অল্প সময়ের বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র স্বভাবের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলেন তিনি। তার পর ভাগলপুরে গিয়ে 'খালিফাবাগ' -এ নিজস্ব ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন **'The Sero Bactro Clinic'** নামে। এই ভাবে ডাক্তারীর সঙ্গে যে টুকু যোগাযোগ রইল তা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান যোগাতে লাগল। কারণ বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের যাতায়াত ছিল এই ল্যাবরেটরীতে। **"সমাজের নীচুস্তরের ব্যক্তির সঙ্গে অন্যথা তাঁর এমন যোগাযোগ ঘটতে পারত না। বনফুল তাঁর রচনায় টাটকা বিষয়বস্তু এইভাবেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আমাদের খুব কম সাহিত্যিকেরই এমন সুবিধা সৌভাগ্য হয়েছিল।"**[১৩]

এইভাবে সাহেবগঞ্জের স্কুল থেকে হাজারীবাগের কলেজ হাজারীবাগ থেকে কোলকাতা, কোলকাতা থেকে পাটনা, পাটনা থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যঙ্গালোর থেকে আবার পাটনা, পাটনা থেকে কোলকাতা ও পরে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ তারপরে ভাগলপুর ঘুরে বনফুলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সঙ্গে ছিল তাঁর ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও আরো বহু বিষয়ের গভীর অধ্যয়ন। অভিজ্ঞতার এই বিশাল - বিস্তৃত পরিধি তাঁর ছোটগল্পে বিষয় - বৈচিত্র্যে পরিস্ফুট। এর পরেও আবার একান্তভাবে সাহিত্য রচনার জন্য ১৯৬৮ সালের জুন মাসে বনফুল কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতার লেকটাউনে বাসাভাড়া নেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি এখানেই ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী বনফুলের ব্যক্তিত্বেই ছিল বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা। জীবনমর্মে এক দুঃসাহসিক কৌতূহলের বশেই তাঁর এই বৈচিত্র্যলিপ্সা গড়ে উঠেছিল। **'খেয়ালী ও ওরিজিন্যাল'** বনফুল প্রাণধর্মের স্বাতন্ত্র্যে বিচিত্রকর্মা শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। জীবন ভাবনায় বৈচিত্র্যের অন্বেষণই ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। বস্তুতঃ জগৎ ও জীবনের প্রতি অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহে জন্ম দিয়েছে বৈচিত্র্যের পিপাসা। বনফুলের এই বিষয় - বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **" বনফুল মূলতঃ জীবন সম্পর্কে অশ্রান্ত কৌতূহলী। তাঁর কৌতূহল জীবনের সকল ক্ষেত্রে -- ইহলৌকিক পারলৌকিক, স্বপ্নলোক,বস্তুলোক, বিজ্ঞান দর্শন, কাব্য ইতিহাস নরনারীর বাস্তবজীবন ও অন্তরলোক -- সর্বত্রই তাঁর সমান কৌতূহল।"**[১৪]

বনফুলের এই সদা কৌতূহলী দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে একটি জীবনাদর্শে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। **'আনন্দ, আদর্শ এবং নির্ভীকতা'**র সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি মানব জীবনে একটি সামগ্রিক ঐক্যের রূপ তুলে ধরেছেন, যা তাঁর জীবনবাদ তথা জীবনবেদও বলতে পারে। তিনি জীবনকে কখনো খণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন নি, তিনি জীবনের এক সামগ্রিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর গল্পে সত্য-শিব-সুন্দরের রূপ পাই। বনফুল মনে প্রাণে জানতেন বাস্তবকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকদের সত্য -শিব - সুন্দরের আরাধনা করতে হয়। এই **'বাস্তবের ভিত্তিভূমি'** বা অভিজ্ঞতা বনফুলের গল্পে যে বিচিত্রতার আমদানী করেছে তাতে তাঁকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাবাদী লেখক বলা চলে না, তিনি সেই জীবন অভিজ্ঞতার যেমন রূপকার, তেমনি ব্যাখ্যাকারও বটে।

অতঃপর আমরা বনফুলের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সৃষ্টিসম্ভার থেকে চয়ন করে কিছু গল্প আলোচনা করে তাঁর বিষয় -বৈচিত্র্যের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্ট করতে পারি।

সমগ্র জীবনব্যাপী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বনফুল তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শের জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলেন, যে আদর্শ জীবনের পূর্ণতার কথা বলে, সৌন্দর্য্যের কথা বলে, আনন্দের কথা বলে, ঐক্যের কথা বলে, অখণ্ড জীবনপ্রবাহের কথা বলে। আসলে বনফুল

অমৃত পিপাসু। সমস্ত কুৎসিত, অন্ধকার, হতাশা, খণ্ড -বিচ্ছিন্নের মধ্যে অমৃতময় এক জীবনানুভূতিতে উত্তীর্ণ হওয়া বনফুলের মনোধর্ম। কেননা তিনি মনে করতেন — **"সুখের সন্ধানে যখন আমরা চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞান -বিজ্ঞান, গুরু-বন্ধু, অর্থ -সম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই।. . . . চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন— অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"**[১৫] জীবনের সেই পূর্ণতার কথা বনফুল বলেছেন তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে।

দেহ খণ্ড ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দেহপিণ্ডে অনুভূত প্রেম চিরন্তন, চিরজীবী অবিনশ্বর। মানব জীবনে প্রেমের বিচিত্র লীলাখেলা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে , সেই প্রেমেরই এক অদ্ভুত রূপ অঙ্কিত হয়েছে বনফুলের প্রথম গল্পে **"চোখ গেল"** - তে। যে প্রেম বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে এক সীমাহীন অনন্ত অমৃতময় অনুভূতি। গল্পের নায়ক তথা কথক মিনি নামে এক দুষ্টু মেয়ের কথা বলেছেন, যে **'সাধারণের চোখে হয়তো সুশ্রী ছিল না'**, বক্তাও তাকে **'খুব সুন্দরী'** বলে মনে করতেন না, কিন্তু তাকে ভালোবাসতেন। কারণ মিনির চোখ দুটোতে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি বক্তাকে আকৃষ্ট করেছিল। মিনির সেই চোখ দেখে বক্তা **'মুগ্ধ'** হয়েছিলেন এবং তারপর **'একদিন নিভৃতে আদর'** করে তাকে বলেছিলেন— **'ইচ্ছে করে তোমার চোখ দু'টো কেড়ে রাখি।'**

'কেন?'

"ওই দুটোই তো আমাকে পাগল করেছে। আমি সবচেয়ে ওই দুটোকেই ভালোবাসি।"

এত ভালোবাসা সত্ত্বেও বক্তা তথা গল্পের নায়ক মিনিকে পায় নি। **'অজ্ঞাত পরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল'**। নিয়ে যাওয়ারই কথা, কেননা, বক্তা মিনির চোখকেই শুধু ভালোবেসেছিল, **'সমগ্র মিনির জন্য তার প্রাণ নিবেদিত হয় নি'**। এরূপ যে ঘটবে এটা খুব স্বাভাবিক, কেননা খণ্ডিত প্রেমকে বনফুল কখনো জীবনাদর্শ বলে মনে করেন নি। মিনির বিয়ে অন্যের সঙ্গে হওয়াতে বক্তার 'প্রাণে বড় বাজিল।'

কিন্তু যে বেদনা হয়তো কালের নিয়মে সময়ের সাথে সাথে মুছে যেত, **'যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।'**

বিবাহের পর মিনি বাপের বাড়ি এলে পরে বক্তা দেখলেন, **"তাহার দুইটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ হিসেবে শোনা গেল যে, চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া যে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।"** বক্তার সঙ্গে একদিন মিনির দেখা হলে বক্তা বললেন—**'অসাবধানতার জন্যে অমন দু'টি চোখ গেল।'**

মিনি উত্তর দিল, **'কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক, তা হলে না জানাই**

ভালো।'

এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেন্টিমেন্টালপূর্ণ নির্বুদ্ধিতা হলেও প্রেমের এক মহান রূপ অঙ্কন করেছেন বনফুল এখানে। গল্পের নায়ক খণ্ডিত ভাবে প্রেমকে অনুভব করতে, পেতে চেয়েছিল, তাই সে মিনিকে পায় নি। কিন্তু মিনি বক্তাকে যে মনের অন্তঃস্তল থেকে পেতে চেয়েছিল তা তার কথা থেকেই বোঝা যায়। বক্তা ভেবেছিলেন অসাবধানতার জন্যেই হয়তো মিনি চোখ দু'টি গিয়েছে। কিন্তু মিনি শেষ কথা থেকে তা স্পষ্ট যে সে বক্তাকে কতটা মনে প্রাণে চাইতো। 'কেন যে গেল'— তার কারণ যদি বক্তা একটু তলিয়ে ভাবেন তাহলেই যে তার উত্তর পাবেন কিম্বা আমরাও পেয়ে যাই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মিনিও যে বক্তাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল এবং চাইত তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, আর এও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যে চোখ দিয়ে সে তার প্রাণ-পুরুষকে দেখেছিল, সে চোখ দিয়ে সে অন্য কাউকে আর মনের মানুষরূপে দেখতে চায় না। পুরুষের হৃদয় হয়তো এই নির্বোধ ভালোবাসা কোন অর্থ খুঁজে পায় না। কিন্তু যে নারী সর্বস্ব হৃদয় দিয়ে তার ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে চায়, তার কাছে এ প্রেম এক সীমাহীন ব্যঞ্জনার অনুভূতি নিয়ে আসে। তাই সে নারীর চোখে বাহ্যিক জগৎ লুপ্ত হয়ে গেলেও অন্তরে অন্তহীন প্রেমের বিশুদ্ধ শিখা প্রজ্জ্বলিত থেকেছে। গল্পের কথক তথা নায়ক মিনির চোখ দু'টির সৌন্দর্যই শুধু দেখেছিল, কিন্তু সে চোখের ভেতরে যে মিনির মনের কত কথা লুক্কায়িত ছিল তা কথক বুঝতে পারেন নি বা বোঝার চেষ্টাও করেন নি। মিনি এত ছোট নয় যে সে ভুল করে গোলাপ জলের পরিবর্তে অন্য চোখ নষ্টকারী ঔষধ দেবে। এ মিনির সচেতন মনের কর্ম। যদিও গল্পকার মিনির চঞ্চল চরিত্রের কথা বলেছেন, তবুও সেই চঞ্চলতার মধ্যেও মিনির যে একটি স্থিরতা ছিল তা বোঝা যায়। তাই অসাবধানতা নয়, মিনি সচেতনভাবেই গোলাপ জলের পরিবর্তে অন্য ঔষধ দিয়ে চোখ দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। মিনির শেষ কথাগুলিতে সে সত্য প্রকটিত হয়। গল্পের শেষের মিনির সেই 'কেন' শব্দেই কথকের প্রতি গভীর ভালোবাসার ইঙ্গিত রয়েছে। মিনির আত্মক্ষয়কারী এই প্রেম কথকের প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই তার মহনীয়তাকে প্রকাশ করেছে। এভাবে মিনি বক্তাকে কখনো কোন কিছু না বললেও যেন অনেককিছু বলে গিয়েছে। বক্তা মিনিকে 'নিভৃতে আদর করিয়া' তার প্রেম নিবেদন করেছিল। 'আড়ালে' ডেকে মিনির সঙ্গে যে কথাও বলত তার ইঙ্গিত রয়েছে গল্পে। এমন নির্ভীকভাবে যে পুরুষ প্রেম নিবেদন করে তা সে আংশিকই হোক না কেন তার প্রতিই তো নারী হৃদয় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তাই গল্পে কথক মিনির শুধু চোখ দু'টোকে ভালবাসলেও মিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে। মিনি যেন তার চোখ দু'টো নষ্ট করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পের নায়ক তথা কথককে একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, প্রেম কখনও দু'টি চোখ দিয়ে আংশিক রূপে অনুভবের বস্তু নয়, তা অন্তর দিয়ে সমগ্রভাবে উপলব্ধির বিষয়।

"বাড়তি মাশুল" গল্পে বনফুল নিষ্ঠুর নির্মম অদৃষ্টের হাতে মানুষের চরম 'বিড়ম্বনা'র

কথা রূপায়িত করেছেন। গল্পের বক্তা একজন **'ডেলি প্যাসেঞ্জার'**। **'সমস্ত দিন আপিসে কলম পিষে উর্ধ্বশাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেনের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে'** হাপাচ্ছেন - এমন সময় সামনের প্ল্যাটফর্মে **'বোম্বে মেল ছাড়ছে'**, আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ' তার চোখে পড়ল, যাতে তাঁর বুক আনন্দে ভরে উঠল। এই আনন্দের কারণ হল বহুদিন পূর্বে তার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজখবর করেও আর তাকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ সেই পুত্রের মতই, **'হ্যাঁ সে মুখটি বোম্বে মেলের একটি কামরায় দেখতে'** পেলেন।

এরপর তড়িঘড়ি করে বক্তা গিয়ে উঠলেন বম্বে মেলে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছেড়ে দিল, ট্রেনে উঠে বক্তা আশ্বস্ত হলেন, মনে হল **'হ্যাঁ, ঠিক সেই।'** পাশে এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন, ভয়ে ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে বক্তা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন **"এতদিন কোথায় ছিলি? আমাকে চিনতে পারিস?"** কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে বক্তা হতবম্ব হয়ে গেলেন। ছেলেটি হিন্দিতে উত্তর দিল- **"হামারা নাম পুঁছতে হেঁ? কেঁও? হামরা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।"** বক্তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার! দ্বিতীয় বার পুত্র হারা হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফিরতে হল **'Excess Fair'** — **'বাড়তি মাশুল'** দিয়ে।

আসলে মানব জীবনে হারানোকে পাওয়ার যে সুখ তা অনির্বচনীয়। বক্তা তার প্রাণের সন্তানকে ফিরে পাবেন বলে এমন করে হয়তো কতবার বাড়তি মাশুল চুকিয়েছেন। জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্তের জীবনে অদৃষ্টের পীড়ন আরও এক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত করেছিল সে সময়। তাই সারাদিন কলম পিষে উর্দ্ধশ্বাসে জীবনের পেছনে দৌঁড়তে দৌঁড়তে বক্তা যখন হাপাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখের সামনে তাঁর সন্তানকে দেখতে পেয়ে **'সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে'** উঠলেও কিন্তু পরক্ষণেই সে আশা-আনন্দ চরম - হতাশা, **'বিড়ম্বনা'**র মধ্যে ডুবে গেল।

"অজান্তে" গল্পে রূপলাভ করেছে আমাদের সমাজের আত্মকেন্দ্রিক ভালোবাসার এক নিষ্ঠুর রূপ — যে ভালোবাসা বস্তু কেন্দ্রিকতার আবরণে মানবিক বোধ সমূহকে আচ্ছন্ন করে, মানুষ যার জন্য যথার্থই অমানুষে পরিণত হয়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। গল্পের নায়ক যেখানে তাঁর স্ত্রীর একখণ্ড **'বডিস'** অর্থাৎ অন্তর্বাস নিয়ে বিপর্যস্ত বর্ষার দিনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বাড়ি গিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবেন আর প্রেম নিবেদন করবেন তার স্ত্রীকে। যার জন্য অন্ধকার গলিতে অন্ধ ভিখারীকে না জেনে-শুনে লাথি মারতে ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে তার বাধে না। গল্পটি এরকম — গল্পের নায়ক অফিসে মাইনে পেয়েছেন, তাই বাড়ি ফেরার পথে ভাবলেন, **"ওর জন্যে একটা বডিস্ কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে। এ-দোকান সে দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।"** জামাটি কিনে বেরিয়েছেন, অমনি বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। বৃষ্টি একটু থামাতে জামাটি বগলে

করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।বড় রাস্তা পেরিয়ে এলেন, তারপর এক অন্ধকার গলিতে। **'গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে'** চলেছেন, সে কত ভাবনা! মনের রঙিন নেশায় যখন ডুবে হেঁটে চলেছেন **'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল'** বক্তার। সেও পড়ে গেল, গল্পের নায়কও পড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল জামাটি। গল্পের নায়ক উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু **'লোকটা তখনও ওঠেনি — উঠবার উপক্রম করছে।'** রাগে গল্পের নায়কের সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল। সে লোকটিকে এক লাথি মেরে বসলেন আর বললেন - **"রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার?" "মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল, কিন্তু কোনও জবাব করলে না।"** এতে গল্পের নায়কের **'আরও রাগ হল'** এবং আরো মারতে লাগলেন লোকটিকে। **"গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন — "ব্যাপার কি মশাই?"** গল্পের নায়ক তখন বললেন— **"দেখুন দিকি মশাই - রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে! কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল —"** তার পর সেই আগন্তুক ভদ্রলোক গল্পের নায়ককে বললেন — **"কে - ও? ওঃ থাক্ মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে — "** তার পর গল্পের নায়ক দেখলেন **"মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে — গা-ময় কাঁদা"** আর গল্পের নায়কের **"দিকে কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে আছে।"**

গল্পের **'বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী'**র কাতরমুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে গল্পের নায়ককে আর না মারার যে প্রার্থনা করেছে তাতে গল্পের নায়কের মতো আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। গল্পের নায়ক অন্ধ ভিখারীটিকে যে মুহূর্তে লাথি মেরেছে তা যে কোন স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধ দেহ, সর্বস্ব ভালোবাসার টানে সে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, আত্মকেন্দ্রিক ঠুনকো ভালোবাসার সেই রূপ চিত্রণ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সহনশীলতা যে ভালবাসার থাকে না, তা নিতান্তই এক বাতিকগ্রস্থ বিভ্রান্তিকর মানসিকতাজাত, ব্যর্থতাই যার চূড়ান্ত পরিণাম। মানবিক মূল্যবোধের এই চরম অবক্ষয় বনফুলকেও চঞ্চল করে তুলেছিল, এই আত্মসুখ পরায়ণ ভালোবাসার, না স্বার্থপরতার আর এক নামান্তর, তার চরম পরিণাম কি? এ প্রশ্ন বারবার বনফুলের মনে জেগেছিল। যার এক নেতিবাদী উত্তরই খুঁজে পেয়েছিলেন বনফুল। বিমূঢ় বিভ্রান্ত যুগের আত্মসর্বস্ব তথা আত্মক্ষয়কারী ভালোবাসার রূঢ় বাস্তব চিত্রণ আর কি হতে পারে?

এই আত্মসুখপরায়ণ ভালোবাসার একেবারে বিপরীত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে **'তাজমহল'** গল্পে। যেখানে হৃদয়-ঐশ্বর্যে ভালোবাসা মহিমান্বিত। মুঘল সম্রাট শাজাহান বহুপত্নীক হলেও মমতাজ ছিলেন তার হৃদয়েশ্বরী। তাই মমতাজের মৃত্যুর পর তার প্রেমানুভূতিকে অক্ষয় অমর করে রাখার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে বহু দেশী-বিদেশী সুদক্ষ কারিগর দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন

আগ্রার সুরম্য বৈভব-ঐশ্বর্যে-সৌন্দর্যের স্থাপত্য তাজমহল। ইতিহাসের পাতায় ও মানুষের হৃদয়ে তা আজও অম্লান। তাজমহল আজ শুধু মমতাজের প্রতি শাজাহানের একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন মাত্র নয়, তা সর্বযুগের, সর্ব কালের মানব মানবীর একনিষ্ঠ প্রেম-ভালোবাসার প্রতীক। মুঘল বাদশার নির্মিত এই তাজমহলের পাশাপাশি বনফুল আর এক মনের তাজমহল তৈরীর গল্প বলেছেন, যা কোন সম্রাট - বাদশার নয়, ফকির শা-জাহানের, যে তাজমহলের ভিত্তি **'কতগুলো ভাঙ্গা ইঁট আর কাঁদা'**। যেখানে অর্থের দম্ভ নেই, মর্মরের বৈভব নেই, ঐশ্বর্য নেই, আছে শুধু হৃদয়ের অন্তর্লীন একনিষ্ঠ ভালোবাসা।

গল্পের আখ্যান বস্তুটি বড় চমৎকার ও হৃদয়স্পর্শী। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। গল্পের কথক-নায়ক একজন ডাক্তার, যিনি **'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে'** এসেছেন। বক্তা প্রথম যখন আগ্রা এসেছিলেন এবং তাজমহল দেখেছিলেন, তখন দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহলকে দেখে মনে হয়েছিল **'চুনকাম করা সাধারণ একটি মসজিদ'**। তবু তিনি নির্নিমেষে চেয়েছিলেন তাজমহলের দিকে কারণ হাজার হোক তা শা-জাহানের তাজমহল, যাতে বহু প্রেমকথার, ইতিহাস স্মৃতি বিজরিত। একে একে মনে, আলমগীর, দারাসেকোর নানা কথা মানস পটে ভেসে ওঠে বক্তার। এরপর পূর্ণিমার পরদিন, যখন চাঁদ ঠিকমত ওঠে নি, জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার তাজমহল দর্শন করতে গিয়েছেন কথক, গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কথকের মানসপটে যেন অতীতের চাপা কান্না ভেসে এলো, তার পর যখন চাঁদ উঠল তখন **'জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন'** কথককে। তারপর বহুদিন কেটেছে, তাজমহলকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ব্যবসাদারদের নোংরা ব্যবসা দেখে দেখে কথকের তাজমহলের প্রতি যেন আর আকর্ষণই নেই, **'পাশ দিয়ে গেলেও'** না। **'অন্ধকারে জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায় ঊষায়, শীত-গ্রীষ্মে, বর্ষা- শরতে বহুবার বহুরূপে'** কথক দেখেছেন তাজমহলকে। তাই তাজমহলকে **'আর চোখে লাগে না, চোখেই পড়ে না'**।

এই অভ্যস্ত প্রাত্যহিক জীবন -যাপনের মধ্যে একদিন কথকের আউটডোর সেরে বারান্দা থেকে নামার পথে এক বৃদ্ধ মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। পিঠে তার প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা, ঝুড়ির ভারে তার মেরুদণ্ড যেন বেঁকে গেছে। ঝুড়িটি নামাতেই কথক দেখলেন ঝুড়ির ভেতর এক বোরখা পরা মহিলা বসে আছে, বাড়িতে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য না থাকায় হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে নিয়ে এসেছে। বোরখা খুলতেই কথক দেখলেন দূরারোগ্য **'ক্যাংক্রাম অরিস'**-এ **'মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।'** দূর থেকে বয়ে এনে এরোগের চিকিৎসা সম্ভব নয় ভেবে কথক অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই তাদের থাকতে বললেন, কিন্তু দুর্গন্ধে কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে না চাওয়ায় হাসপাতালের কাছে একটি

বড় গাছের তলায় রেখে চিকিৎসা করতে লাগলেন। **"বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে।"** বৃদ্ধ রোজ হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে যেত আর কথক মাঝে মাঝে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে আসতেন। এভাবেই চলছিল। তারপর একদিন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কথক **'কল'** থেকে ফিরছেন, তখন হঠাৎ দেখলেন **'বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে'**। সঙ্গে বেগম সাহেবাও আপাদমস্তক ভিজে গেছে আর **'কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি।'** জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কথক হাসপাতালের বারান্দাতেই আপাতত নিয়ে যেতে বললেন, এরপর বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলো যে তার স্ত্রীর বাঁচার কোন আশা আছে কিনা। কথক সোজাসুজি জবাব দেন **'না'**। বৃদ্ধ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দিনকতক পরে কথক দেখলেন **'গাছতলা খালি। কেউ নেই।'** আরও কয়েকদিন পরে কথক 'কল' থেকে ফিরছেন একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সেই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদে বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন মাঠের মাঝে **'কতগুলো ভাঙা ইঁট আর কাদা দিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।'** কথক প্রশ্ন করাতে বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে বললেন— **'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'** কথক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, **'খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর'** কথক তার বাসস্থান ও নাম জানতে চাইলে বৃদ্ধ বলে, সে আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়ায়, নাম— **'ফকির -শাজাহান।'** কথক তখন **'নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে'** রইলেন। এই হল গল্পের আখ্যান বস্তু।

গল্পের আখ্যান বস্তু পড়ে আমাদের মনে তাই একটি প্রশ্ন জাগে, সম্রাট শাজাহানের নির্মিত বহুমূল্যবান রত্নের নির্মিত তাজমহল আর ফকির শাজাহানের ভাঙা ইঁট আর কাঁদা দিয়ে গড়া সমাধির মধ্যে ভাবগত দিক থেকে কোন পার্থক্য আছে কি? না, নেই। সম্রাট শাজাহান সম্রাট হওয়ায় তার বৈভবময় প্রকাশ আগ্রার সেই সৌন্দর্যময় সৌধ নির্মাণে, যা পত্নীপ্রেমের একনিষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল, আর ফকির শাজাহান ফকির হতে পারেন, কিন্তু তার প্রিয়তমার প্রেম নিবেদনে তিনিও সম্রাট শাজাহানের চাইতে কোন অংশে কম নয়, প্রেম ভাবনার দিক থেকে তাই সম্রাট শাজাহান, আর ফকির শাজাহানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, প্রেমের মৌলিকতায় উভয়ে এক। বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে তাদের মধ্যে বিস্তর ফাঁরাক মনে হবে, কিন্তু অন্তরধর্মে তাঁরা উভয়ে একনিষ্ঠ হৃদয়সর্বস্ব প্রেমিক। উভয়ে যেন এই কথাই বলে— **'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'** আসলে প্রেমতো কোন টাকা -পয়সা, বৈভব -ঐশ্বর্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না! প্রেম অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য, যা জীবনকে সুন্দর, মধুময়, অবিস্মরণীয় করে রাখে। যিনি প্রকৃত প্রেমিক তার কাছে ইঁট ও দামী মর্মরের অনুভূতি নিয়ে আসে, সামান্যও সীমাহীন আনন্দের অনুভূতি নিয়ে আসে। ফকির শাজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি যে প্রেমের একনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধির গন্ধে যেখানে সকলেই অতিষ্ট, অথচ যেখানে নির্বিকার চিত্তে **'বৃদ্ধ মুমূর্ষু স্ত্রীর সেবা করে চলেছে।'** এতো সেবা নয়, এযেন প্রেমের পূজা। আর্থিক

অনটনের মধ্যেও নিজের শরীরের শেষ সামর্থ দিয়ে বৃদ্ধ স্ত্রীর সেবা করেছে। মনে প্রাণে চেয়েছে তার প্রিয়তমা যেন সেরে ওঠে। আসলে ফকির শাজাহান ভালোবেসেছিল তার স্ত্রীর আত্মাকে। তাই পরলোকগতা স্ত্রীর আত্মার প্রতি প্রেম নিবেদন করেছে ভাঙ্গা ইঁট আর কাঁদার গাঁথুনি দিয়ে, হয়তো তা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু অন্তরে পত্নীর প্রতি যে প্রেমের অমরাবতী তৈরী করেছে তা আজীবন থাকবে তার হৃদয়ে। প্রেমের এমন আন্তর্জাতিক শাশ্বতরূপ বনফুল ছাড়া আর কে অঙ্কন করতে পারে? বনফুল যেভাবে সম্রাট শাজাহানের ঐশ্বর্যময় প্রেমের পাশে ফকির শা-জাহানের তাজমহল নির্মাণ করেছেন, তা যেন এক বলিষ্ঠ চিরন্তন প্রেমের অভিজ্ঞান। বৈভব - ঐশ্বর্য -সৌন্দর্যের পুঁজি দিয়ে নয়, ফকির শাজাহান স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ সেবাতে, স্ত্রীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেম নিবেদনে গড়ে তুলেছিল তাঁর ভালবাসার সৌধ, হোক না তা **'ভাঙা ইঁট আর কাদা'** র। অন্তরের ঐশ্বর্যে সম্রাট শাজাহান কিছুটা যেন ম্লান করে দেয় ফকির শাজাহান। ফকির শাজাহানের তাজমহল তাই দর্শনীয় মনোহর কোন স্থাপত্য নয়, তা সম্পূর্ণ অনুভবের বস্তু। বনফুল তাজমহলের এই দুই বিপরীতধর্মী চিত্র রচনা করে প্রেমের এক শাশ্বত রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ছোটগল্পের খণ্ড জীবনের রূপায়নে অখণ্ড, বৃহতের, মহতের ব্যঞ্জনা কিভাবে সৃষ্টি করা যায়, বনফুল তা খুব ভালোভাবেই জানতেন। যে খণ্ডজীবনের পরিচয় আমরা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, লোকালয়ে, নির্জনে, উৎসবে-আনন্দে -বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাই। বনফুলে **"এক ফোঁটা গল্প"** -টিতে মানব চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে। যেখানে মানব ও পশুতে একাকার হয়ে গেছে। আমরা সাধারণত জন্মদাত্রী মাতাকেই প্রকৃত মাতা হিসেবে মানি, পালিত মাকে নয়, কিন্তু বনফুল জন্মদাত্রী মাতার চেয়ে পালনকর্ত্রী মাতাকেও কোন অংশে কম মনে করেন নি। যার পরিচয় আমরা **'এক ফোঁটা গল্প'** -টিতে পাই। অবশ্য এগল্পের পেছনে বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত পরোক্ষভাবে থাকলেও থাকতে পারে। কেননা, বনফুল ছোটবেলা তাদের বাড়ির মুসলমান চাষি চামরুর স্ত্রীর স্তনপান করে পুষ্ট ও বড় হয়েছিলেন।

গল্পের আখ্যানটি সংক্ষেপে এরকম— রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু একটু খেয়ালী ও খাপছাড়া লোক ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে গল্প -কথককে নিমন্ত্রণ করেছেন, গল্পের কথক ভাবলেন **'শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না!'** কারণ তিনিই হলেন সেখানকার একমাত্র ডাক্তার। দ্বিধান্বিত চিত্তে গল্প-কথক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন **"শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া।"** বক্তা এরপর শ্যামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, **"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"** শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন— **"ও আপনি শোনেন নি বুঝি? আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা— সত্যিকারের মা ছিলেন।"** শ্যামবাবু কথাগুলি বলতে বলতে আবেগান্বিত হয়ে

পড়ছিলেন। গল্প-কথক তখন বললেন— **"কি রকম? কে তিনি?"** শ্যামবাবু বললেন— **"আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই, সেই থেকে ওই গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এতবড় করেছে। ওরই দুধে আমার দেহমন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"** এই বলে তিনি হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে গল্প-কথকের **"বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।"**

বস্তুতঃপক্ষে সত্যি-ই আমাদের মনে তখন একটি প্রশ্ন জাগে, সত্যিকারের মা কে? জন্মদাত্রী মা, নাকি পালনকর্ত্রী মা। আসলে জন্মদাত্রী মাতার চাইতে পালনকর্ত্রী কোন অংশে ছোট নয় বরং তার ভূমিকা ও মূল্য একটু বেশী। তাই শ্যামবাবুর কাছে জন্মদাত্রী মাতা ও মঙ্গলাগাই একই। কারণ মঙ্গলা গাইয়ের দুধেই তার দেহ মন পুষ্ট এবং তিনি এতবড় হয়েছেন। গল্পটিতে শ্যামবাবুকে আমাদের হয়তো একটু অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু চরিত্রটির সেই অদ্ভুত খেয়ালীপনার মধ্যে একটি অন্য জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। **'এক ফোঁটা গল্প'** তাই তার একফোঁটা হয়ে থাকেননি, তাতে বৃহতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

সমাজের চরম অত্যাচারের যুগেও মানুষের চরিত্রের সনাতন মূল্যবোধের উদ্বোধনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন বনফুল। তাই সর্বনাশা সামাজিক ভাঙন ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে এক সমাজ-সন্ধানী মানবিক বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছেন **"দুধের দাম"** গল্পে।যখন মধ্যবিত্ত সমাজ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে, হয়ে উঠছে ক্রমশ অমানবিক, সেই অবক্ষয়ী মূল্যবোধের যুগেও মানুষের মধ্যে যে মানবিক অনুভূতি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি তার এক আশ্চর্যরূপ ফুটে উঠেছে **"দুধের দাম"** গল্পে।

গল্পটির কেন্দ্রে আছেন এক বৃদ্ধা, যার কপালে সারাক্ষণ অবহেলা, অপমান, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ,ঘৃণা জুটেছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধাই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছেন শেষে। যিনি উপকারের মূল্যস্বরূপ রেলের এক কুলিকে দুধ খাওয়ার জন্য দু'টি টাকা দিয়েছেন ছেলে সম্বোধন করে। তখন সেই দু'টাকার অর্থমূল্য এক দু'টাকার সীমা ছাড়িয়ে বহুমূল্যবান জীবনদ্যোতনা নিয়ে আসে।

গল্পটি সংক্ষেপে এরকম—ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়িতে এক যাত্রীর হোল্ডঅল -এর স্ট্র্যাপে পা আটকে পড়ে গিয়ে বৃদ্ধার পা মচকে যায়। ক্ষমাপ্রার্থনা বা সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা, যার ব্যাগে পা আটকে গিয়েছিল, সে ব্যক্তি বৃদ্ধাকে না দেখে-শুনে পথচলার জন্য ভর্ৎসিত করে। বৃদ্ধা বহুকষ্টে ট্রেনে ওঠে বসার জায়গা না পেয়ে মেঝেতেই বসলেন। ইতিমধ্যে পা ফুলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বৃদ্ধা বুঝলেন একা তার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। বৃদ্ধার পাশে তার ছেলে ও নাতির বয়সি বহু বাঙালি ছিল। বৃদ্ধা তাদের করুণভাবে অনুরোধ জানালেন তাঁকে একটু নামিয়ে দেওয়ার জন্য। সকলেই শুনল, কিন্তু না শোনার ভান করল, কিন্তু উপরন্তু তাঁকে নানা জনে নানা কটূক্তি করল। শেষে এক অবাঙালী কুলি বৃদ্ধার অসহায়তার কথা জানতে পেরে বৃদ্ধাকে দু'হাতে

বুকের কাছে তুলে ওয়েটিং রুমের মেঝেতে বসিয়ে রেখে আসে। কুলিটি বৃদ্ধাকে জানিয়ে যায়, 'গয়া প্যাসেঞ্জার' এলে সে আবার আসবে। সেখানে দু'টি ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলে দুই শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একজন খবরের কাগজ, অন্যজন ইংরেজি বই পড়ছিল। তারা বৃদ্ধাকে ভিখারী ভেবে একজন পকেট থেকে পয়সা বের করে বৃদ্ধার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'পয়সা ওঠালেও, তুম হি কো দিয়া।' উত্তরে বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বললেন— **'আমি ভিখারী নই বাবা, আমি আপনাদের মতো এক প্যাসেঞ্জার।'** শিক্ষিত বাঙালি দু'টি আরো নানা অপমানকর কথা বলতে লাগল। ইতিমধ্যে কুলিটি এসে বৃদ্ধাকে জানালেন যে, **'মাইজি গয়া প্যাসেঞ্জার** আগিয়া'। কুলিটি বৃদ্ধাকে **'তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মতো বুকে তুলিয়া** লইয়া বাহির হইয়া গেল' এবং কামরার মধ্যে এক বেঞ্চের এক কোনে বসিয়ে দিল। তারপর **'বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।'** কিন্তু কুলিটি জানায় তার মজুরী আট আনা। সে কিছুতেই ধর্ম বিক্রি করে বেশী টাকা নিতে রাজী হয় না। শেষে বৃদ্ধা তাকে বলে **"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা।"** বলতে বলতে **"বৃদ্ধার বলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোনে জল টলমল করিতে লাগিল।"** এরপর কুলিটি বৃদ্ধাকে প্রণাম করে বিদায় নেয়।

গোটা গল্পটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পাশে কুলিটি এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রতীক। কুলিটি শুধু কুলি হয়ে থাকেনি। বৃদ্ধার কাছে সন্তান তুল্য হয়ে উঠেছে। কারণ, বৃদ্ধাকে ট্রেন থেকে নামানো এবং যথাসময়ে আবার ট্রেনে উঠিয়ে জায়গা করে বসিয়ে দেওয়া একজন ছেলের পক্ষেই সম্ভব। কুলিটি বৃদ্ধার কেউ নয়, অথচ বৃদ্ধার সে অশেষ উপকার করেছে, যা ট্রেনের অন্যরা করেনি বা করার কথাও ভাবেননি। তাই বৃদ্ধা কুলিটিকে সন্তানরূপে সম্বোধন করেছে। বৃদ্ধা বুকের দুধ খাইয়ে তাকে বড়ো তোলেনি ঠিক, কিন্তু সন্তানের মতো কাজ করেছে। যে সমাজে **'শিভাল্‌রি'**-র **'প্রকাশ কেবল যুবতি মেয়েদের বেলা'**, সেখানে কুলিটি এক বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যখন তার মূল্যবোধ, মানবিকতাবোধ হারিয়ে ফেলছে, সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বনফুল এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের রূপ দিয়েছেন এ গল্পে, যা আমাদের চেতনার মূল ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়।

মহৎ, চরিত্রবান মানুষের জীবন চিত্রণের পাশাপাশি বনফুল ভণ্ড মানুষের চরিত্রস্বরূপ উন্মোচনেও সিদ্ধহস্ত। **"পরিবর্তন"** গল্পে দাম্পত্য জীবনের চরম ট্রাজেডির নিষ্ঠুর বর্ণনা দিয়ে ভণ্ড পুরুষের ঠুনকো দাম্পত্য প্রেমের চিত্র নির্মম দৃষ্টিতে রূপায়িত করেছেন। গল্পটি এরকম—

হরিমোহনের স্ত্রী সরমা পতিব্রতা নারী। হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে জেনে তার পতি সেবার কোন ত্রুটি রাখে না। দিনরাত পতিসেবা সত্ত্বেও হরিমোহন মৃত্যুর দিকে ধীরগতিতে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে। সরমা যেদিন বুঝতে পারল যে তার স্বামীর বাঁচার সম্ভাবনা কম, তখন সরমা চরিত্রের এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। **'সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ'** পান করে।

যক্ষ্মা রোগীর এঁটো খাওয়া বিপজ্জনক ভেবে গল্প-কথক ডাক্তার সরমাকে সতর্ক করে দেয়। সবকথা শোনার পর সরমা গল্প-কথক ডাক্তারবাবুকে বলে— **"উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হলেও বা কথা ছিল।"** হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে একসময় সরমার দু'টো লাংসই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলো এবং তার মৃত্যু হল। অথচ হরিমোহন কিন্তু মরল না। ধনী হরিমোহন সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে রোগমুক্ত হল। হরিমোহন দেশে ফিরে আবার একটি বিবাহ করে। হরিমোহন অবশ্য প্রথম স্ত্রীকে ভোলেনি, ততটা হৃদয়হীন সে নয়! তাই অনেক **'খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর** একজনকে' বিয়ে করে।

পতিব্রতা স্ত্রীর জীবনদানের কি অসাধারণ প্রতিদান! যে স্ত্রী নিজের জীবন স্বেচ্ছায় বিপন্ন করে ঐকান্তিক প্রেমে স্বামীর দিন - রাত সেবা করেছে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, সেই স্বামী সবকিছু ভুলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বসল! যার মরার কথা ছিল সে বেঁচে গেল, যাঁর বেঁচে থাকার কথা ছিল সেই মরে গেল। হরিমোহনের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে, সে আবার বিবাহ করেছে, পাত্রী পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নাম পরিবর্তন হয়নি। আর পরিবর্তন হয়নি হরিমোহনের চরিত্র। আমাদের সমাজে এমন হরিমোহনের অভাব নেই। বনফুল হরিমোহনের জীবনচিত্রে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। বনফুল ছিলেন সুস্থবোধ সম্পন্ন জীবন-শিল্পী। তাই তাঁর গল্পে অন্তহীন জীবন বৈচিত্র্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে তার অন্তঃ প্রবেশী নিরপেক্ষ দৃষ্টি, যাতে গল্পগুলি আরো অনুভবতায় গভীর হয়ে উঠেছে। বনফুলের গল্পভাবনার বলিষ্ঠ অভিজ্ঞান সেখানেই। আসলে জীবনে বাঁচার তো একটা অবলম্বন চাই। সরমার সেই অবলম্বন ছিল তার স্বামী, কারণ তাদের কোন সন্তান ছিল না। তার জীবনের এই নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট খায় আর হরিমোহন বাঁচার জন্য, জীবন উপভোগ করার জন্য সুইজার ল্যাণ্ডে পাড়ি দেয় অসুখ সারাতে, সারিয়ে জীবনের অবলম্বন হিসেবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সরমা নামের অন্য এক নারীকে। হরিমোহনের পত্নীপ্রেম নেই, আছে আত্মপ্রেম, আর সরমা প্রেম তা ছিল না, যখন বুঝেছিল তার স্বামীর বাঁচার সম্ভাবনার কম। সরমার পতিপ্রেম ছিল নিখাঁদ। হরিমোহনের ছিল ভণ্ড পত্নিপ্রেম। হরিমোহন আত্মসুখপরায়ণ স্বার্থপর শ্রেণীর মানুষ।

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সংকট কত জটিল আকার ধারণ করেছিল তার পরিচয় আছে **"বেচারামবাবু"** গল্পে। নিজের জীবন যেখানে টেকানো দায়, সেখানে সংসারের চাহিদা পূরণ করা যে সে সময় কত অসাধ্য ব্যাপার ছিল তা বেচারামবাবুর জীবন চিত্রে বুঝে নিতে পারি।

নিম্নমধ্যবিত্ত বেচারামবাবু সংসারের সকলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত। দু'দণ্ডেন্ডর শান্তি নেই তার মনে। উপরন্তু রয়েছে তার স্ত্রীর কটাক্ষপূর্ণ অবুঝ মন্তব্য। সংসারে দায়িত্ব কর্তব্য থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়নি বেচারাম, নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছে যতটা

সম্ভব সংসারের সকলের চাহিদা মেটাতে। পাঁচকন্যা, দুই পুত্র নিয়ে মোট সাতজনের সংসার। মুদিখানার দোকানে দেনা, বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর বাড়ির দাবি, আরেক কন্যার পণের জন্য বিয়ে দিতে পারছেন না। স্ত্রী হরিমতিরও নানা সাংসারিক চাহিদা মেটাতে মেটাতে সর্বশান্ত বেচারামবাবু। সংসারের হাজারো অভাবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে বন্ধু - বান্ধবদের সঙ্গে গল্পের আসরে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। কিন্তু তবুও পরিত্রাণ আছে কী? রাতে শুতে গিয়ে দেখলেন 'ছেলে-মেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে'। কারণ জানতে চাইলে স্ত্রী বললেন— **"শীত পড়ে গেছে কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করানো হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর! তোমাকে তো বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল?"** বেচারা বেচারাম কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। **"শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়ে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।"**

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই মোমবাতির মত কেরাণী বেচারামের জীবনীশক্তিটাও নিঃশেষিত হয়ে চলেছে প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে। অর্থনৈতিক নিগ্রহে বেচারাম বাবুর জীবন বিপর্যস্ত। সংসারের হাজারো অভাব মেটাতে গিয়ে দিশেহারা বেচারামের তাই গল্পের আসরে ডুব দিতেই হবে। নচেৎ সংসারের হাজারো প্রশ্নের মুখে কোন উত্তর খুঁজে না পেতে পেতে একদিন বেচারাম যে হারিয়ে যাবে!

"বুধ্‌নী" গল্পে রূপায়িত হয়েছে প্রেমোন্মত্ততার এক বিকৃত রূপ, যা জীবনের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকটিত হয়েছে। আপাত ভালো মানুষের অন্তরালে এক বন্য মানুষের আত্মপ্রকাশ। মানুষ আর পশুতে পার্থক্য বিচার বুদ্ধিতে, চেতনায়, সংস্কৃতিতে, উন্নততর জীবনভাবনায়, নিঃস্বার্থ প্রেম প্রীতিতে। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তিতে মানুষ আর পশুতে কোন প্রভেদ নেই। **'বুধ্‌নী'** গল্পে বর্বর জীবনের এক বিচিত্র প্রণয়লীলা রূপায়িত হয়েছে, যা জৈবপ্রবৃত্তি তাড়িত।

গল্পটি সংক্ষেপে এরকম— হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী সাঁওতাল বিল্টু ভালোবেসে বিয়ে করেছিল **'নিকষ কালো কৃশাঙ্গী কিশোরী'** বুধ্‌নীকে। অবশ্য তার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় বিল্টুকে। প্রাণ সংশয় করে জিতে নিতে হয় বুধনীকে। সহজ স্বাভাবিক ছন্দে তাদের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। সেখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না। **"বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নিকে একদণ্ড ছাড়ে নাই। এক দণ্ডও নয়। বনে, জঙ্গলে, পর্বতে, গুহায় এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতো।" "কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানব শিশু। বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিল্টু দেখিল— একি! বুধনীকে দখল করিয়া বসিয়াছে শিশুটা! বুধনীতো তাহার আর একার নাই। অসহ্য!"** এর পরেই বিল্টু হত্যা করে শিশুটিকে,

যার জন্য তার ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু **"সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করিয়া গেল— বুধ্নী— বুধ্নী— বুধ্নী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।"**

সাধারণ সভ্য সমাজের দৃষ্টিতে বিল্টুর এই আচরণ কিন্তু অস্বাভাবিক, বিকৃত মস্তিষ্কজাত মনে হতে পারে, কিন্তু বিল্টুর প্রেমের মহত্ব সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের চোখে বিল্টু খুনী বলে মনে হলেও প্রেম নিষ্ঠায় সে একক অপরাজেয় সত্তা। তাই সে বুধনীর মাঝখানে দ্বিতীয় কাউকে সহ্য করতে পারেনি। এমনকি তার নিজের সন্তানকেও না। ভালোবাসার গভীরতা কখনো কখনো অসহিষ্ণু অধিকার বোধে পরিণত হয়। বিল্টুর ভালোবাসা সেই গোত্রের। অধিকার স্পৃহার নির্মম উন্মত্ততায় বুধ্নীকে একান্ত নিজের করে ধরে রাখতে চায় বিল্টু। তাই সেই অপ্রতিরোধ্য একরৈখিক প্রেমের মধ্যে অন্য কেউ এসে স্থান দখল করে বসুক, তা বিল্টু মেনে নিতে পারেনি। তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে নিজের সন্তানকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করে বসে। এতে তার কোন আত্ম -অনুশোচনা নেই, গ্লানি নেই, অন্যায় বোধ নেই, পাপ-পুণ্য বোধ নেই। কারণ তার কাছে বুধনী ছাড়া আর সবকিছু তুচ্ছ। প্রাণ সংশয় বাজিতে জিতে সে বুধ্নীকে পেয়েছে। বিল্টু বুঝেছে যতদিন ঐ শিশু বুধ্নীর কোল জুড়ে থাকবে, ততদিন বুধনীকে ফিরে পাবার আশা তার নেই। তাই আত্মজনকে হত্যা করতেও এতটুকু মনে বাধে নি তার। এ মানসিকতা সভ্য সমাজে পাগলামি বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু জঙ্গলের এই- ই নিয়ম। জংলী বিল্টু সেই নিয়মকে অনুসরণ করেছে মাত্র। ফাঁসির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিল্টু শুধু বুধ্নী বুধ্নী বলে চিৎকার করে গেছে। আসলে **"নারীও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ যুগ, সমাজ, সময় ভেদে এক ও অবিচ্ছিন্ন। কিশোরী বুধ্নীকে দেখে ধনুকধারী বিল্টুর কামনা ও তাকে তাড়া করার পেছনে নিকৃষ্ট ধরনের আদিরস ও অশ্লীলতা ফুটে উঠলেও বিশ্বজনীন প্রেম কথার এটাই মূল কাঠামো। সভ্য সমাজে উপকরণ ও পদ্ধতির প্রভেদ আছে কিন্তু স্থূল মৌল আবেদনের কোন প্রকার নেই।"**[১৬] নিষ্ঠুর নিয়তি সভ্যতার হাত ধরে বিল্টুর চিৎকার স্তব্ধ করে দিলেও সহৃদয় পাঠক আজও যেন দেখতে পান তীব্র হাহাকার, শুনতে পান বিল্টুর করুণ আর্তনাদ।

বনফুল সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-ভাবনা অনুসারী ছিলেন, উচ্ছৃলতাকে তিনি মনে প্রাণে মেনে দিতে পারেন নি। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে বনফুল আস্থাশীল। যৌবনের উচ্ছৃলতা, উদ্দামতা, সীমালঙ্ঘন, বিড়ম্বনা, গতিপ্রাণতার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল, কিন্তু যে যৌবনের আচরণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, সেই অসংযমী যৌবনধর্মকে বনফুল সমর্থন করেননি কোনদিন। তীব্র কশাঘাত হেনেছেন সেই অসংযমী আচরণের প্রতি। যার নিদর্শন মেলে **"জৈবিক নিয়ম"** গল্পে।

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে রোগা গোছের একটি উনিশ -কুড়ি বছরের ছেলে যৌবনের সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতে এমন সব আচরণ করছিল যাতে লেখকের প্রথমে মনে হয়েছে জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। **"প্ল্যাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী ছিল। তার মধ্যে দু'জন সাঁওতাল, একজন ঐ ছোকরা আর একটি মেয়ে। ছেলেটি প্ল্যাটফর্মে এমন সব আচরণ**

করছিল যাতে মেয়েটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।" ট্রেনে মোট বইবার ভাড়া এত বেশী কেন, ট্রেন এত লেট কেন, এনিয়ে এত জোড়ে জোড়ে ছেলেটি কথা বলছিল, যাতে তরুণীর দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয়। ছোকরাটি মেয়েটির সামনে খানিকক্ষণ পদচারণা করল। তারপর শিশ্ দিতে দিতে সোডা ওয়ালাকে ডাকল, সোডাটি এমনভাবে পান করছিল, যে সোডা পান করাটাও যেন একটা বীরত্ব। তারপর চানাচুরওয়ালাকেও অকারণে কটূক্তি করল, যদিও চানাচুর কিছু কিনল। এসব বাহাদুরীর লক্ষ্য ওই তরুণী। বলা বাহুল্য, সেই তরুণীও সেই ছোকরাকে দেখছিল, চোখাচোখিও হতে লাগল। চানাচুর কিনে ছোকরাটি মেয়েটিকে খেতে অনুনয় করল, মেয়েটি লজ্জিত হলেও খেল। কথাবার্তায় মেয়েটি পরের ট্রেনে যাবে জেনে ছোকরাটি আবার তার সামনে **'বুক চিতাইয়া উন্নত মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ পদচারণা করিল।'** তারপর ছোকরাটি অকারণে গায়ের পেশীগুলো ফুলোতে লাগল, একটু শিস্ দিল, প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল পারার চেষ্টা করতে লাগল, কিছু ফুল পেরে মেয়েটির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে ট্রেন চলে এসেছে প্ল্যাটফর্মে। ছোকরা গাড়িতে উঠে জিনিসগুলো ঠিকঠাক রেখে আবার নেমে আসল, তরুণীটির পানে একবার চেয়ে দেখল, **'দেখিল তরুণীও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।' "ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল। তখনও ছোকরা ট্রেনে উঠে না। ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশী বাড়িয়াছে তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য হাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষনাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নীচে—চাকার নীচে পড়িয়া গেল। আর কিছু করিবার সুযোগ পাইল না।"**

ছোকরাটির যাবতীয় বাহাদুরী দেখানোর পেছনে ছিল ঐ মেয়েটি। ছোকরাটি নিজের পৌরুষ প্রতিপন্ন করতে চাইছিল মেয়েটির সামনে। ছোকরাটির অসংযত যৌবনই তাকে এসব করতে যেন অস্থির করে তুলেছিল। তাই বেহিসাবী যৌবন উন্মাদনা তার করুণ পরিণাম ডেকে আনল। **'বাহুল্য ও আতিশয্যে'** যৌবনের ধর্মের সহজ প্রকাশ ঘটলেও তার নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন, নচেৎ তা জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমনটি ছোকরাটির হয়েছে। বনফুল যৌবনের এই অনিয়ন্ত্রিত উদ্দামতাকে কোন দিনই সমর্থন করেননি। আসলে যে বয়সের ধর্ম তা অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রিত করার মত ক্ষমতাও তাদের থাকে না সবার, যাদের থাকে তারা সঠিকপথে জীবনকে পরিচালিত করতে পারে, আর যাদের তা থাকে না তারা ঐ ছোকরার মত **'পা ফসকাইয়া'** ধ্বংসের মুখে, মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বশে মানবজীবনের চরম দুর্ভোগের কথা রূপায়িত হয়েছে **"দিবা-দ্বিপ্রহর"** গল্পে। গল্পটিতে সাপের ওঝার প্রতি মানুষের মূঢ় আস্থাকে বনফুল হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিয়েছেন।

দিবা-দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে লোকের ভীষণ ভীড় কারণ হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে যে গোখুরে সাপটি সকালে কামড়েছিল, তাকে ইঁটের গাঁদা থেকে বের করে বিশুবাগ্‌দী

বল্লমের আগায় বিঁধে রেখেছে। দূরে এক ব্যক্তি গাছতলায় বসে ছাতু খাচ্ছিল। সে ভিড়ে যোগদান করেনি। খানিক পরে সেই আগন্তুক এমন আচরণ করে এবং কথাবার্তা বলে যাতে সকলের ধারণা হয়, ঐ ব্যক্তি যথার্থ গুণী ওঝা। আগন্তুক বলল, **'পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'** পায়ের বাঁধন খোলা হল। তারপর বলল, **'সাপটাকে ছেড়ে দাও।'** বিশুবাগদী বলল, **'ফের যদি ছটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে?'** আগন্তুক বলে, **"কামড়াবে? আচ্ছা আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে? চালাকি নাকি?"** নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক সাপটিকে ধরল, **'ধরিবামাত্র সাপটি সগর্জনে তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল।'** এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগন্তুক বাম হাতে সাপটিকে ধরে গর্জন করে উঠল, তারপর বল্লম খুলে নেওয়া হল। সাপটি আগন্তুকের বাম হাতেও কামড়ে দিল। তখন আগন্তুকের মুখে অদ্ভুত হাসি। অট্টহাস্যে চতুর্দিকে কাঁপিয়ে তুলল। সাপটিকে আগন্তুক বলল, **'রাগ করছ কেন, চাঁদ, চুমু দাও একটা আমাকে।'** সাপটি তৎখণাৎ ওঝার গণ্ডদেশে দংশন করল। সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল, **"হারু ঘোষের মেজ ছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।"** তারপর দারোগা এস আগন্তুককে চিনতে পেরে বললেন **'একেই তো আমরা খুঁজছি।'** শোকার্ত হারু ঘোষ দারোগার কাছে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলে দারোগা বলেন— **"এ একটা পাগল। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।"**

প্রকৃত পরিচয় না জেনে অন্ধ বিশ্বাসের বশে জীবনে কতবড় সাংঘাতিক অঘটন ঘটতে পারে **'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'** তা এ গল্পে দেখিয়েছেন। যাকে এতক্ষণ সকলে ভেবেছিল মস্তবড় ওঝা, পরে জানতে পারল যে, সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা একটি পাগল।

বনফুল সুস্থ -শুদ্ধ জীবন -প্রত্যয়বাদী শিল্পী। তাই জটিল সংগ্রামের আবর্তে মানুষের জীবন যখন হাঁসফাস করছিল, সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে এক আদর্শ জীবনবোধকে অন্বেষণ করেছেন তাঁর গল্পে । তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আদর্শ জীবনবোধের সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের সংঘাত সৃষ্টি হলেও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রত্যয়বাদী শুদ্ধ আদর্শ জীবনবোধকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছেন। সমকালীন বৈনাশিকতার কাছে তাঁর শিল্পীমন কখনো পরাজয় স্বীকার করেনি, আত্মসমর্পণ করেনি। বনফুলে সেই সুস্থ -বলিষ্ঠ জীবন বোধের এক শিল্পীত রূপলাভ করেছে **"খুড়ো"** গল্পে।

'খুড়ো' গল্পের কাহিনীটি সংক্ষেপে এরকম— নানা সদগুণের অধিকারী খুড়োর সংসারে নিত্য অভাব -অনটন। কারণ, নবাব গঞ্জের জমিদার বাবু যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তাঁর নানা সদগুণের জন্য তাঁকে যথেষ্ট খাতির করতেন। জমিদার প্রদত্ত পাঁচবিঘা লাখেরাজ জমি চাষ করে খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলত, এমনকি অন্যান্য অভাবও মিটত। কিন্ত জমিদার বাবুর মৃত্যু হওয়ায় তার আধুনিক পুত্রের এ জাতীয় বাজে খরচ পছন্দ না হওয়ায় আত্মসম্মানী খুড়ো জমিদার বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দিল। অভাব তার সংসারে এখনো নিত্যসঙ্গী। শত অভাবের মধ্যেও খুড়োর

মধ্যে এমনকি একটি ছেলেমানুষি স্বভাব ছিল, যার জন্য বৃদ্ধ খুড়ো গ্রামের সকলেরই প্রিয় ছিল। সংসারে সীমাহীন অভাব সত্ত্বেও খুড়োর মনে কখনো প্রফুল্লতার অভাব ঘটেনি। মুখে এক টুকরো অদ্ভুত হাসি নিয়ে সে খুড়িমার সমস্ত সাংসারিক অভিযোগকে অদ্ভুত উদাসীনতায় উড়িয়ে দিত। সংসারের অভাব মেটানোর চেয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে **'মহা উৎসাহে'** গুলি খেলতে খুড়োর বেশী আনন্দ। ঘরে একখানা ভাল লেপ-তোষক নেই সে সামনের শীত কাটবে। তিন বছর যাবৎ বলতে বললে। **'লেপ-তোষক সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই'** খুড়িমা। খুড়িমার তীব্র ভর্ৎসনা, অভিযোগ-অনুযোগ শোনার পর পাড়ার কিছু হিতেষী ছেলে কুড়ি টাকা চাঁদা তুলে খুড়োকে শহরে পাঠালেন লেপ-তোষক কিনে আনার জন্য। কিন্তু শহর থেকে খুড়ো ফিরে আসার পর গল্পকথক ভাবলেন কিরকম লেপ-তোষক কিনেছে তা দেখে আসা যাক। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই গল্পকথক শুনতে পেলেন, **'খুড়িমা তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন।'** আগ্রহ সহকারে গল্পকথক খুড়োর বাড়ির দিকে এগোলেন। **"বাড়িতে ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—দেখ তো ভাই— জিনিসটা ভালো হয় নি? আঠারো টাকায় এমন জিনিস কি পাওয়া যায়, দেখি— খুড়ো সেতার হাতে বসিয়া আছেন।"**

এই খুড়ো আসলে আনন্দবাদী জীবনশিল্পী। যিনি হাজারো অভাব অনটনের মধ্যে মনের সহজ সুন্দর বৃত্তিগুলিকে মেরে ফেলেননি। খুড়ো চরিত্রের এই জীবন পিপাসা যেন বনফুলেরই অন্তরসত্তার একখণ্ড প্রকাশ। আসলে খুড়ো সৌন্দর্য্য সন্ধানী। তাই রূঢ় বাস্তব জীবনের আবর্তে পরে খুড়ো যেখানে লেপ-তোষক বানাতে পারছে না তিন বছর ধরে, পাড়ার হিতৈষীরা লেপ-তোষক বানানোর জন্য টাকা যোগাড় করে দিলেও সেই টাকায় সে কিনে আনে একটি সেতার। যে সেতারের সুরে জীবনের হাজারো অভাবের কথা অনায়াসে ভুলে থাকা যায়, এক সুন্দর অনুভূতির জগতে পাড়ি দেওয়া যায়। খুড়ো আসলে সেই সুস্থ, শুদ্ধ, সুন্দর জীবন-সন্ধানী শিল্পী-মানুষ।

ব্যক্তিমানুষের ভণ্ডামীর প্রতি বনফুল যেমন খড়গহস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সমাজের পচনশীল মানসিকতাকে তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। সমাজের দোষত্রুটি, স্বভাব, স্বরূপ তিনি অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। সামাজিক অধঃপতনের তেমনি এক নির্লজ্জ উলঙ্গরূপ **"সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ"** গল্পে উন্মোচিত করেছেন।

গল্পটি এমন — সনাতনপুরের প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বর বাবু হঠাৎ নিরুদিষ্ট হওয়ায় গ্রাম সুদ্ধ তুমুল উত্তেজনা ও নানা কুৎসিত আলোচনার শুরু হয়েছে। কারণ — **'শ্যামা নাম্নী ধোপানীটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছেন।'** প্রত্যেকরই ধারণা যে, শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকা সত্ত্বেও সেই ধোপানীর সঙ্গে তার কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যার দরুণ এই বৃদ্ধ বয়সে শৈলেশ্বরবাবুর এই চরিত্রচ্যুতি। সকলেই যে-যার মতো নানা কৌতুককর কুৎসা রটিয়ে চলল, এমন কি গ্রামসুদ্ধ সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। নানা জনে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে

লাগল, খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর নিয়ে জানতে পারলেন, শ্যামা ধোপানীর স্বামী পিরু ধোপার কাছে কাল মার খেয়েছে। পাড়ার লোকজনের আরো সন্দেহ হল, এর পরেই তারা আত্মগোপন করেছে। বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় তো বলেই ফেললেন, **'পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!'** গ্রামের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরূদ্ধে উত্তেজনার বশে অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লেন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। **'অচিরকালের মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ি মহাশয়ের বিরূদ্ধে রায় মহাশয়ের, রায় মহাশয়ের বিরূদ্ধে মুকুজ্জে মহাশয়ের, মুকুজ্জে মহাশয়ের বিরূদ্ধে গাঙ্গুলী মহাশয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।'** গ্রামের এমন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে গ্রামে দু'টি ঘটনা ঘটল — এক. শ্যামা ধোপানী হঠাৎ গ্রামে ফিরে আসল, জানা গেল, সে তার মামার বাড়ি গিয়েছিল, পিরুর সঙ্গেও তার কোন কলহ নেই। দুই. **'শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়,কূপে পড়িয়া। গ্রামের একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কুঁয়া ছিল।"** তাঁর ভিতর থেকে গলিত শবদেহটা আবিস্কার করেছেন মল্লিক মহাশয়।

সমগ্র গল্পটিতে বনফুল গ্রামের মানুষের নগ্ন কলুষিত মানসিকতা, বিকৃত রুচির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তাতে সমাজের কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত - সকল শ্রেণীর মানুষের রুগ্ন মানসিকতাকে চিহ্নিত করে। সমাজের অভ্যন্তরে এই ব্যাধির স্বরূপ রূপায়ণ সত্যিই যেমন উপভোগ্য, তেমনি বাস্তব সম্মত।

বনফুলের সমাজ মনস্কতার আর এক বাস্তবসম্মত রূপ **"উৎসবের ইতিহাস"** গল্পে বিধৃত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরী প্রার্থী যুবকের এক বিপর্যস্ত মানসিকতার গল্প এটি। প্রথম শ্রেণীর এম.এ. নরেন মল্লিকের তিরিশ টাকা মাইনের কেরানির চাকরি পাওয়ার জন্য কিভাবে সমাজের খোসামোদ, অনুরোধ করতে হয়েছিল, অর্থাৎ **'তেল মারতে'** হয়েছিল, তার জীবনের সেই অনপনেয় জটিলতার ইতিহাস **'উৎসবের ইতিহাস'**। এই রুগ্ন চিত্র আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তৎকালীন সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের রুগ্ন রূপটি।

গল্পটি এরকম — অনন্যোপায় নরেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সাগ্রহে বিশু সান্যালকে **'তৈলাক্ত করিতেছে'**। বিশু সান্যালকে সুচারু রূপে তৈলাক্ত করার পর নরেন মল্লিক বুঝলেন যে, তার তৈলনিষেক শক্তি নিঃশেষিত হয়নি। এখনও বহু লোককে সে তৈলসুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ না করে নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হলেন এবং তাকে যারপরনেই তৈলাক্ত করলেন। ঘুঘু পানু মিত্তিরকেও তৈলাক্ত করলেন। কিন্তু একের পর এক ব্যক্তিকে যথাসাধ্য তৈলাক্ত করার পরও কিন্তু নরেন মল্লিকের সেই কেরানি চাকরি জোটেনি। এর জন্য নরেন মল্লিককে আরো প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। তা হল —**'নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পানি পীড়ন করিতে হইবে।'** প্রতিশ্রুতি মত — **"সেই চাকুরী পাইয়াছে। হউক কেরানিগিরি, হউক বেতন তিরিশটাকা — চাকুরী তো!"** এই তিরিশ টাকার মাইনের শর্তসাপেক্ষ চাকরি পেয়েছে, তাই নরেন মল্লিকের পিতা প্রবীণ মল্লিকের বাড়িতে এই উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসবের ইতিহাসের পেছনে যে ইতিহাস নিহিত তা সেকালে যেমন বনফুলকে ভাবিয়েছিল একালেও আমাদের ভাবায়। শিক্ষিত এম.এ. পাশ ছেলের জীবনে এর চেয়ে করুণতম পরিণাম আর কি হতে পারে! এ থেকে যেন পরিত্রাণ নেই বেকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। জীবনের এমন শাশ্বত রূপ নির্মাণেই বনফুলের শিল্পী মানসের অভিজ্ঞান।

বনফুল শুধু ইহ জগতের রূপচিত্রণই করেননি, পারলৌকিক বা অলৌকিক জগতেরও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এই অলৌকিক রসের গল্পের মধ্যে **"অধরা"** গল্পটিতে এক নির্জন রাত্রির পটভূমিকায় প্রিয়ার সান্নিধ্য অনুভবের কথা থাকলেও শেষে তা ভ্রান্তি বলে মনে হয় গল্প কথকের। গোটাগল্পে এক অলৌকিক পরিবেশ রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগায়।

গল্পটি এইরকম — গল্পকথক অন্ধকারে একটা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, **"সেও সঙ্গে ছিল না। তার অঙ্গসৌরভ বলয়-নিক্কণ, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব"** করেছিলেন কথক। কথকও তার অশরীরী অনুভূত প্রিয়ার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বলে চলেছেন। কথকের মনে হচ্ছিল **'শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।'** কথক যেন যুগ যুগ চেয়ে ফিরেছেন তাঁর অন্তরে অনুভূত প্রিয়াকে। তাই তার প্রশ্ন —**'এত করে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন?'** কথক উত্তর দিলেন - **'ধরা দিলে কই?'** কথক **'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে'** প্রিয়াকে অনুভব করতে চান। কিন্তু তার প্রিয়া সেখানে ধরা দেয় না। এরপর **'দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিঃশ্বাস। মনে হল খুব কাছে সরে এসেছে ..... তার চোখের জল গালে পড়ল'** কথকের তা **'বরফের মত ঠাণ্ডা'** মনে হলো। সহসা সচেতন হয়ে কথক দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে। কথক বাড়ির দিকে চলেছেন, **"সেও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি..... সেও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে! সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন..... তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ "** পেলেন যেন কথক। পাশাপাশি ছুটে চলেছেন, নির্জন অন্ধকার পথ পেরিয়ে দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলেন, **'সেও উঠল।'** কথক ঘরে ঢুকলেন, **'সেও ঢুকল'**। লাইটের সুইচ টিপতেই তীব্র আলোয় চতুর্দিক ভরে উঠল। কথক দেখলেন — **'কেউ নেই'**।

গল্পের এই রহস্যময় পরিবেশ পাঠকের মনে রোমাঞ্চ জাগায়। গল্প কথকের অবচেতন মনের এই বিশেষ অনুভূতি গল্পে অলৌকিক বাতাবরণ তৈরী করেছে। **'সে'** এখানে গল্পকথকের অনুভূত অশরীরী প্রিয়া? না নির্জন প্রকৃতি চেতনতা? না প্রবহমান কালচেতনা? না বনফুলের **'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়লোকে'** অনুভূত আত্মা? মনে হয়, এ বনফুলের অতীন্দ্রিয় দিয়ে চিরন্তন কাল প্রবাহকে ধরার, অনুভব করার প্রচেষ্টা। যা যুগ-যুগান্তর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। এই কাল প্রবাহ অখণ্ড, অনন্ত, তাকে ধরা সম্ভব নয়, তা অধরা।

উক্ত গল্পের বিষয়বস্তুগুলি থেকে আমরা একটি কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি — বনফুলের ছোট গল্পের বিষয়বস্তু অফুরান, কোন একটি বিষয়ের অনুবর্তন ঘটেনি। তাঁর গল্পের বিষয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল – সর্বত্র প্রসারী। এ বিষয়ে বনফুলে অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিমল গোস্বামী লিখেছেন

— "তোমার কল্পনা শক্তি বহু বিস্তারী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে আসা তোমার এক নিঃশ্বাসের ব্যাপার। তুমি যা দেখেছ ,যা শুনেছ তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মীতা আছে তাকে তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়।" বস্তুতপক্ষে বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি কোন একটি বিশেষ মাত্রায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তার জন্য তাঁর সমগ্র ছোটগল্পই পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে বনফুলের সেই বিপুল-বিচিত্রস্বাদী ছোটগল্পের কিঞ্চিৎ স্বাদগ্রহণ করা গেল। আসলে বনফুলের মানব জীবন সম্পর্কে প্রতিরোধ্য সদা-অন্বিষ্ট কৌতূহল ছিল। সারা জীবন ব্যাপী তিনি বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মানব জীবনের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাঁর গল্পে বিচিত্র স্বাদের অনুভব নিয়ে এসেছে। তাছাড়াও বনফুল নিজেও ছিলেন বৈচিত্র্য লিপ্সু। তিনি সব সময় **'নতুন কিছু'** লেখার তাগিদ অনুভব করতেন। এক সময় তিনি দুই পুত্রের পড়াশোনা, দুই কন্যার বিবাহ ও গাড়ি-বাড়ি কেনার জন্য বিভিন্ন সময় কিছু প্রকাশকের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আর সেই ঋণ পরিশোধের জন্য অবিশ্রান্ত ধারায় তিনি লিখে গেছেন। তবে আবোল-তাবোল কিছু লিখে ঋণশোধের চেষ্টা করেননি। সবসময় **'নতুন কিছু'** লেখার প্রেরণা তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল। এ সম্পর্কে বনফুল নিজেই বলেছেন — **"ঋণশোধ করিবার তাড়নায় আমাকে অনেক বই লিখিতে হইয়াছিল- আমি অবশ্য যাতা আবোল-তাবল লিখিয়া আমার ঋণশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই। আমি প্রতিটি বইতে নূতন স্বাদ পরিবেশন করিয়া ভালো বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।"**[১৭] বনফুলের লেখার প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বৈচিত্র্য প্রকাশের অভীপ্সা তাঁর রচনাকে বিচিত্রস্বাদী করে তুলেছে। একথা তাঁর ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মানবজীবন সম্পর্কে সদা কৌতূহলী মনোভাব এবং জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সদা বৈচিত্র্য লিপ্সু মনোধর্ম তাঁর ছোটগল্পে বিচিত্র রামধনুর রং ছড়িয়েছে। চলমান জীবন স্রোতে বনফুল যা দেখেছেন তার থেকে যে জীবনসত্য অনুধাবন করেছেন, তাকে এক একটি গল্পে রূপ দিয়েছেন। এই বিষয়-বৈচিত্র্যর জন্যই তাঁর ছোটগল্প আমাদের কখনো **'বোরিং'** করে না, বরং গল্প পাঠে আরো আগ্রহ জন্মায়।

তবে শুধু বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কারণেই নয়, মানব জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসায়, মমত্ববোধে মানুষের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে বনফুল কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন। এ তাঁর সচেতন অভিপ্রায়। যে কারণে তিনি শৈশবকাল থেকে নানা কীটপতঙ্গ, পাখীদের অনুসরণ করে বিচরণ করেছেন বনে-বাদারে, যৌবনের প্রথম পাদে ঘুরে বেড়িয়েছেন কলকাতার পথে পথে, যে নেশা তাঁর পরিণত বয়সেও অব্যাহত ছিল। এছাড়া সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি তাঁর গল্পে এক বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিয়ে এসেছে। বনফুলের গল্পের বৈচিত্র্যময় জীবন অন্বেষণ সম্পর্কে বন্ধুবর পরিমল গোস্বামী **'বনফুলের গল্প সংগ্রহের' 'প্রথম শতকের'** ভূমিকায় লিখেছেন — **"মানুষের জীবনকে তুমি চলচ্চিত্রের মতো দেখেছ। জীবনের স্রোত, বিচিত্র মানুষের স্রোত ভেসে চলেছে সম্মুখ দিয়ে, তুমি বসে আছ পাশে — তার এক একটি মুহূর্তকে টেনে তুলে এক**

একটি ছবি রচনা করবে বলে। মাছ রাঙা মাছের আশায় যেমন জল থেকে একটু উঁচু জায়গায় বসে থাকে, তেমনি। তোমার গল্প ধরা আর তার মাছ ধরার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

তোমার হাতে এই সব জীবন অথবা চরিত্র চিত্রণ বিচিত্র, সংখ্যা অগণিত। নির্দিষ্ট পরিসরে এমন বহু বিচিত্র ছবি দেখা কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটে।"[১৮]

অবশ্য বনফুল মাছরাঙার মত শুধুমাত্র বিচিত্র জীবনের ছবিই শুধু তুলে ধরেননি, তার স্বরূপ উন্মোচন ও ব্যাখ্যা করেছেন বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ দৃষ্টি দিয়ে। অনেক সমালোচক অবশ্য বনফুলের বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রশংসা করলেও ভাবের গভীরতার অভাব লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু একথা সর্বোতভাবে ঠিক নয়। বনফুল এমন বহু গল্প লিখেছেন, যা ভাবগভীরতায় সমৃদ্ধ।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১। 'বাংলা ছোটগল্প' — শিশির কুমার দাস। দে'জ পাবলিশিং। পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৭। পৃ. - ১৯১।

২। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' — চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'বাণীশিল্প' প্রকাশনা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ. -৭৫৭ - ৭৫৮।

৩। 'বনফুলের ফুলবন' — ড. সুকুমার সেন।সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ. - ৯।

৪। 'বনফুলের উপন্যাসে পাখসাট শোনা যায়' প্রবন্ধ— মনোজ চাকলাদার। পশ্চিমবঙ্গ। ৬ ও ১৩ আগষ্ট, ১৯৯৯,বনফুল জন্মশতবর্ষ স্মরণ ক্রোড়পত্র। পৃ.-১০২।

৫। 'পশ্চাৎপট' — বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ১৯৫।

৬। 'মর্জিমহল'— বনফুল (২৪-তম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ: ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৭২।

৭। 'পশ্চাৎপট' — বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ১৪।

৮। ঐ, পৃ. - ৪৭।

৯। ঐ, পৃ. - ৭৯।

১০। ঐ, পৃ. - ৭৯।
১১। ঐ, পৃ. - ১১৯।
১২। ঐ, পৃ. - ১৩৫।
১৩। 'বনফুলের ফুলবন' —— ড. সুকুমার সেন।সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ. - ১৯-২০।
১৪। 'কালের প্রতিমা' —— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। চতুর্থ সংস্করণ: নভেম্বর ২০০৫। পৃঃ - ১১৮।
১৫। 'কাব্যপ্রসঙ্গ' : 'শিক্ষার ভিত্তি' —— বনফুল (দ্বাদশ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২৭শে আশ্বিন ১৪১০/১৪ই অক্টোবর ২০০৩। পৃ. - ৪৭৬-৪৭৭।
১৬। ' বাংলা ছোটোগল্পের ক্রমবিকাশ' —— সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৬শে জানুয়ারী ২০০৭। পৃ.- ২৪৬।
১৭। 'পশ্চাৎপট' —— বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ২২৫।
১৮। ' বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'—— চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। দ্বিতীয় খণ্ড, বাণীশিল্প প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ.- ৭৫১।